Journal of One Initiative Research and Development
an international multidisciplinary journal
Vol.: 04 Issue: 01 January-June 2025
ISSN: **2958-2776**

ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে চাপাতি আন্দোলনের ভূমিকা

The Role of the Chapati Movement in India's Freedom Struggle

Shahanara Shwopna[1] & Mohammad Ekramol Islam[2]

[1]**Shahanara Shwopna**, Executive Director, Center for National Culture (CNC), Dhaka, Bangladesh, Email: advshahanarabanani@gmail.com

[2]**Prof. Mohammad Ekramol Islam**, PhD, Department of Basic Sciences, Sonargaon University, Bangladesh, Email: meislam2008@gmail.com

Abstract

The people of Bengal were reduced to a ruled class after the defeat of Nawab Siraj-ud-Daulah at the Battle of Polashi in 1757 by the British East India Company. Although the Muslims remained nominally independent rulers until the time of Mir Qasim. Subsequently, the people of Bengal were under British suppression with the defeat of Mir Qasim in the Battle of Buxar in 1764. From then on, British rule began to create a reaction among the people of India. Due to British exploitation and oppression, the people of this country gradually became aware of their rights and began to awaken, as a result, various fights and movements began. In fact, the Indian freedom struggle is a long and complex chapter of world history. This movement was not merely an expression of political consciousness, but also a reflection of broader cultural, social, and psychological shifts. The fight for freedom by the people of India was multifaceted, and people from all social classes participated in it. In the history of this struggle, many movements gained special recognition. Among them, one mysterious, unconventional, and alternative movement in history is the "Chapati Movement". Maulana Yehiya Ali and Maulana Abdullah were the pioneers of this Chapati Movement. To avoid detection by the powerful British enemy, they used the everyday chapati bread as a medium to send all kinds of news about communication and the revolution's progress among the revolutionaries. Therefore, this movement is known as the Chapati Movement. This innovative psychological war strategy gave the British a tough time. The primary objective of this research paper is to examine the origins, purpose, activities, and impact of the Chapati Movement on the Indian freedom movement. The research is descriptive, and the methodology of this research includes ancillary sources, such as articles published in newspapers and books.

Keywords: Company rule, freedom movement, chapati, Chapati movement

JEL Classification: N35, P16, Z19

সারসংক্ষেপ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার জনগন শাসিত শ্রেণিতে পরিণত হন। মীর কাসেমের সময় পর্যন্ত মুসলমানগন নামে মাত্র স্বাধীন শাসকশ্রেণি হিসেবে টিকে থাকলেও ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসেমের পরাজয় বরনের মধ্য দিয়ে তারা ইংরেজদের নিকট পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। তখন থেকেই ইংরেজ শাসনক্রমে এদেশের মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। ইংরেজদের শোষণ ও পীড়নের কারণে ধীরে ধীরে এদেশের মানুষ অধিকার সচেতন হয়। তারা জেগে উঠতে থাকে। আর এভাবেই নানা সংগ্রাম ও আন্দোলন শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসের এক দীর্ঘ ও জটিল অধ্যায়। এই আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক চেতনার অভিব্যক্তি নয়, বরং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের প্রতিফলন। স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর লড়াই ছিল

বহুস্তরবিশিষ্ট এবং এতে অংশ নিয়েছিল সমাজের সব শ্রেণির জনগণ। এই লড়াইয়ের ইতিহাসে অনেক আন্দোলনই বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। তেমনি ইতিহাসের পাতায় এক রহস্যময়, অপ্রচলিত ও ব্যতিক্রমধর্মী আন্দোলন হলো "চাপাতি আন্দোলন"। মওলানা এহিয়া আলি ও মাওলানা আব্দুল্লাহ এই চাপাতি আন্দোলনের প্রবর্তক। শক্তিমান ব্রিটিশ শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও বিপ্লব ঘটানোর প্রক্রিয়া সমন্ধে যাবতীয় সংবাদ প্রেরণ করার মাধ্যম হিসেবে তারা ব্যবহার করেন দৈনন্দিন খাবারের চাপাতি রুটিকে। তাই এই আন্দোলন চাপাতি আন্দোলন নামেই পরিচিত। এই অভিনব মনস্তাত্বিক যুদ্ধকৌশলটি ব্রিটিশদের বেশ বেগ পাইয়ে দিয়েছিল। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে চাপাতি আন্দোলনের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে এর প্রভাব পর্যালোচনা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। গবেষনাটি বর্ণনাধর্মী এবং অত্র গবেষনার পদ্ধতিতে আনুষঙ্গিক উৎস অর্থাৎ পত্র পত্রিকা ও পুস্তিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

Article Info:
Received: 13 Mach 25
Accepted: 01 June 25
Research Area: Polito-cultural Economy
Author's Country: Bangladesh

১.০ ভূমিকা

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান (২০১৮) উল্লেখ করেন, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে নিজেদের ভাগ্য বদলানোর আশায় ইংরেজ বনিকরা প্রথম ভারতবর্ষে আসেন মুঘল সাম্রাজ্যর চতুর্থ সম্রাট মির্জা নূর উদ্দিন মুহাম্মদ সেলিম পরে সম্রাট জাহাঙ্গিরের নিকট থেকে ১৬১৩ সালে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করে। মহা কুটকৌশলি এই বণিকেরা মুসলিম সম্রাটদের সুযোগ নিয়ে তাদেরকেই উচ্ছেদের পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। অত্যাধিক আজ্ঞানুবর্তীতা দেখিয়ে রাজণ্যবর্গদেরকে মন জয় এবং প্রতিবেশী সমাজের বণিকদের সাথে ব্যবসায়িক মিত্রতা তৈরী করে নেয়। ১৬২৪ সালে তারা উড়িষ্যার বালাশোরে এবং ১৬৫১ সালে হুগলীতে নিজেদের কুঠি স্থাপন করে। নবাব শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৪-১৬৬৮) ইংরেজ বণিকদের কর প্রদানে কারচুপি, ব্যবসার শর্ত ভঙ্গ, ঘুষ, দুর্নীতি, দেশীয়দের সাথে সংঘর্ষ ইত্যাদি অপরাধে বাংলায় তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেন। ১৬৮৭ সালে জব চার্নক সুতানুটি থেকে মাদ্রাজ পালিয়ে যায়। ১৬৮৮ সালে বাংলার নতুন সুবাদার হন ইব্রাহীম খাঁ। তার কাছে ইংরেজ বণিকেরা নিজেদের অপকর্মের ক্ষমা চেয়ে বহু আবেদন নিবেদন করে নতুন সুবাদারের কল্যাণে ফিরে পায় আবার ব্যবসা করার অনুমতি। ১৬৯০ সালে জব চার্নক আবার সুতানুটিতে ফিরে আসে এবং সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলকাতা নামক তিনটি অজপাড়া গ্রাম নিয়ে বানিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান (২০১৮) উল্লেখ করেন--"তখন থেকেই ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইংরেজ নাবিক, বনিক ও লোফার এবং তাদের এদেশীয় বর্ণহিন্দুদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিরূপে বেড়ে উঠতে থাকে কলকাতা শহর ।মতিন (২০২১) এর গবেষণা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের অভিন্ন লক্ষ্যে ইংরেজ বণিক ও বর্ণহিন্দু মিলে সৃষ্টি করে মৈত্রীজোট। এই জোটের সহযেগিতায় ইংরেজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ অর্জনে সক্ষম হয়।

১৭৪০ সালে আলীবর্দী খাঁ শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর সময়ে এই মৈত্রী জোটের ষড়যন্ত্র, রোহিলাদের বিদ্রোহ এবং মারাঠা বর্গীদের হামলা- এই তিন পক্ষের প্রবল যন্ত্রনা আলীবর্দী খাঁকে অতীষ্ট করে তোলে। দেশে একটা অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ইংরেজরা ১৭৫৪ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরী করে এবং নিজেদের শক্তি মজবুত করে নেয়। আঠারো শতক থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি কমতে থাকে। আর সে সময়েই তারা ভারতের রাজনীতিতে অনৈতিকভাবে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। দিল্লী থেকে দুরের রাজ্যগুলোতে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৩৬ থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে কলকাতায়

৫২ জন স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ দেয়। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালোভী ইংরেজ ও হিন্দু উভয়ের মধ্যেই পারস্পরিক বোঝাপাড়া সম্পন্ন হয়। ১৭৫৬ সালে আলীবর্দী খান মৃত্যুবরন করেন। তিনি দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলার নাম অভিষিক্ত করে গেলেও সিংহাসন নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এই মুহূর্তকে পরম সুযোগ মনে করে কুটকৌশলিগন তৎপর হয়ে ওঠে, শুরু করে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা বাস্তবায়নে ইয়ার লতিফ, ঘষেটি বেগম ও নবাবের সেনাপতি মীরজাফরকেও অর্ন্তভুক্ত করে নেয়। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ধনকুবের জগৎশেঠ ছিল এই ষড়যন্ত্রের মূল কারিগর। মতিন (২০২১) লিখেছেন "ইংরেজ প্রতিনিধি উইলিয়াম ওয়াটস ও লিউক ক্রেফটনের মাধ্যমে ১৭৫৭ সালের ৪ঠা জুন মুর্শিদাবাদের এক গোপন কক্ষে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও মীরজাফরের মধ্যে এক গোপন চুক্তি হয়"।

এই চুক্তির বলেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে পলাশীর আম্রকাননের যুদ্ধে নবাবের পক্ষের সেনাপতি মীর জাফর তার সেনাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখে। যুদ্ধ নাটক শেষে পরাজিত নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার হত্যার মাধ্যমে বাংলার স্বাধীন সূর্যকে অস্তমিত করা হয়। মাত্র চৌদ্দ মাসের শাসনামলে তিনি শত্রুতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজস্ব অবস্থান সংহত করতে চেয়েছিলেন। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নবান সিরাজ-উদ্-দৌলার তাঁর নিজের দিক থেকে এবং দেশের দিক থেকে ইংরেজ এবং ফরাসী উভয়ের কাছেই সমান থাকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এর কারণ নবাবের নিজস্ব লোকজনদের বৈরিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, প্রভাবশালী বাঙালীদের স্বার্থপরতা, মোগল সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বাংলার দুর্বলতর অবিচ্ছেদ্যতা, বাংলার অবিকশিত নৌবাহিনী, বিশ্বব্যাপী দেশ জয়ের ইউরোপীয় উন্মাদনা এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের ফলাফল হিসেবেই সিরাজ-উদ-দৌলার পতন ঘটে।

ব্রিটিশ ক্রীড়নক নবাব হিসেবে মসনদে বসে মীরজাফর, তবে সব ক্ষমতা থাকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। বিনিময়ে রাজকোষ শূন্য করে মীর জাফরের কাছ থেকে আদায় করে নেয়া হয় সমস্ত সম্পদ, মহামূল্য রত্নভার। এ প্রসঙ্গে নেহেরু (২০১১) বলেন- 'পলাশীর রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধের অভিনয় করিয়া ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দুইটি প্রদেশের- বাংলা ও বিহারের ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসে। ক্ষমতা দখলের প্রথম দিন হইতেই এই শ্বেত 'নবাব' ও তাহার সহচরগন যে লুণ্ঠন আরম্ভ করে , ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলে না ।

উপনিবেশিক ইংরেজ সরকার মুসলিম জমিদার, জায়গীরদার ও অভিজাতদের উচ্ছেদ করে সেখানে হিন্দুদেরকে পুর্নবাসন করছিল এবং পরিকল্পিত কৌশলে ছড়িয়ে দিচ্ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প । প্রচলিত ভাষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসে হাজার হাজার কিতাবখানা, গ্রন্থাগার লুট করে লন্ডনে পাচার করে এবং পুড়িয়ে দেয়। আব্দুল গফুর (২০০৮) লিখেন ১৭৯৩ সালে পূর্বতন ভুমি-ব্যাবস্থা পরিবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজরা তাদের অনুগ্রহভাজনদের মধ্যে নতুন নতুন জমিদার সৃষ্টি করেন এবং একই সাথে মুসলমানদের লাখেরাজ ও ওয়াকফা সম্পত্তি ইংরেজরা দখল করে নেয় এর ফলে সরকারী প্রশাসন, ব্যবসা বানিজ্য সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে একশো বছরের মধ্যেই একটি সমৃদ্ধশালী মুসলিম জাতিকে নি:স্ব করে ফেলে। একই সাথে বিশ্বজুড়ে পরিচালিত বাংলার একচেটিয়া মসলিন, জাহাজ শিল্প ও যুদ্ধ নৌকা তৈরীর কারখানা, মসলার বানিজ্য ধ্বংসসহ আর্থিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে যায় । ফলে বৃটিশ নীল নকশার শিকারে পরিণত মুসলিম সমাজ একদিকে আর্থিকভাবে নি:স্ব হয়, আরেকদিকে নিমজ্জিত হয় অশিক্ষার অতল আঁধারে। এ প্রসঙ্গে আবদুল গফুর (২০০৫)

লিখেছেন- বৃটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ন স্বতন্ত্র। তারা এসেছিল বহিরাগত হিসেবে এদেশকে পদানত করে এদেশের সম্পদ লুন্ঠন করে তাদের স্বদেশ ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধ করতে। ১৭৫৭ সালের পলাশী বিপর্যয়ে আমাদের পরাধীন যুগের সূচনা হয়। বিজাতীয় শোষকদের যাঁতাকলে এদেশের মানুষেরা নিষ্পেষিত হতে থাকে। এর ফলে মাত্র দশ বছরের মধ্যেই সমৃদ্ধ বাংলা হয়ে পড়ে হত-দরিদ্র। ১৭৭০ সাল (বাংলা ১১৭৬) এ দেখা দিল বাংলা জুড়ে দুর্ভিক্ষ্য, খাদ্যের হাহাকার। যে বাংলা হাজার বছরের মধ্যে অভাব চোখে দেখেনি, তারাই অনাহারে ধুঁকে, প্রায় এক কোটিরও বেশী লোক মৃত্যুবরন করে।

বাংলার কৃষক ও উৎপাদক সমাজ ইংরেজের ভয়াবহ করের বোঝায় ভারাক্রান্ত শোষন ও উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ শুরু করলেও শীঘ্রই আত্মরক্ষা ও অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭-দীর্ঘ একশ' বছরের বঞ্চনা, ক্ষোভ, অত্যাচারের বিষ্ফোরক উপাদান ছিল এই স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামকে সুষ্ঠরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনিবার্য কর্মসূচী হয়ে ওঠে 'চাপাতি আন্দোলন'। চাপাতি রুটির ভেতর থাকতো একটি পাতলা কাগজ, যাতে লেখা থাকতো শহীদ হওয়া বিপ্লবীর নাম, পরবর্তী পদক্ষেপের সংবাদ এবং মিলিত হওয়ার সংকেত। প্রতিটি নগর, শহর, বন্দর, গ্রাম, মহল্লায় এই চাপাতি চিঠি' পৌঁছে দেয়া হতো ব্রিটিশভক্ত সেনাদের অলক্ষ্যে। কেউ জানে না কেউ দেখেনা অথচ খবর পৌঁছে যাচ্ছে সর্বত্র। আশ্চর্য এক যুদ্ধকৌশলের নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় চাপাতি আন্দোলন

দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরও জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়কদের সংগ্রাম দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে এ সময় এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান। রোহিলাখন্ডের বাহাদুর শাহ্, মহারাষ্ট্রের তাঁতিয়া তোপী, দিল্লীর শাহজাদা ফিরোজ শাহ্, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, থানেশ্বরের মুন্সী জাফর, মালদহের বেলাল আহমদ, পাটনার পীর আলী, এয়াহিয়া আলী, মোহম্মদ শফি, মিঞা জান, হোসাইনী, আবদুল গফফার, মৌলবী আহমাদুল্লাহ্ শাহ্, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই, বিহারের কুমার সিংহ, আবদুল গনিসহ হাজার হাজার মুজাহিদ পরাধীনতার শিকল ছিন্ন করতে এই মুক্তিকামী সংগ্রামে সম্পৃক্ত হন। চুড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তারা গোপনে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তাদের প্রত্যেকের চিন্তা ও প্রস্তুতির খবর আদান প্রদানে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে 'চাপাতি বিতরন' কর্মসূচী।

রজনীকান্ত গুপ্ত (১৩১৭) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- "এর মধ্যে রুটি বা চাপাতির ঘটনা এসে পড়ে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে এ চাপাতি ঘুরতে থাকে। গ্রামের প্রধান এই চাপাতি অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। কেউ এটা নষ্ট করে না। সরকার অনুসন্ধান করে এর কোনো হদিস বের করতে ব্যর্থ হয়। গুজব রটে যে, এই চাপাতি দেশের মুসলিমদেরকে একসূত্রে গ্রথিত করছে এবং শীঘ্রই সকলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সম্মূখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।"

২.০ গবেষণা পদ্ধতি

১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে চাপাতি আন্দোলনের বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে সামনে আনেন মাথুরার ম্যাজিস্ট্রেট মার্ক থার্নালহিল এবং পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির কর্মকর্তা গিলবার্ট হ্যাডোর-এর চিঠি থেকে। চাপাতি আন্দোলনের প্রাথমিক উৎসের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ঘটনা দুটি উল্লেখ যোগ্য। শিরোনামের বিষয়বস্তু ও গবেষণা উদ্দেশ্য পূরনের জন্য যে কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তা-ই গবেষণা পদ্ধতি।

গবেষণাপত্রটি বর্ননাধর্মী। পত্র-পত্রিকা, প্রকাশিত পুস্তক, বিভিন্ন প্রকাশিত জার্নাল, প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের তথ্যের সহযোগিতা নিয়েই এই গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। শিরোনামটি ইতিহাসভিত্তিক এবং তা ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.০ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইতিহাসের এক প্রান্তিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক আন্দোলনের প্রতি নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষন করা। আন্দোলনের প্রকৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষন করা। ঐ সময় কালে জনগনের উপর এ চাপাতি আন্দোলনের প্রভাবসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী নেটওয়ার্ক এবং রাজনৈতিক ভাবধারা প্রসারে এ আন্দোলন কেমন ভূমিকা রেখেছিল তা উদঘাটন করা। সর্বপরি, এ চাপাতি আন্দোলনের কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যালোচনা করা।

৪.০ আলোচনা ও বিশ্লেষণ

সময়টি ১৮৫৭ সাল। ব্রিটিশ অধিকারকৃত ভারতে সে সময় চলছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ। সে সময়ের আলোচিত সিপাহী বিপ্লবের পাশাপাশি আরও একটি রহস্যময় আন্দোলন শুরু হয়, যা ছিল ব্রিটিশদের উদ্বেগের কারন (সাদিয়া আফরিন শায়লা: ২০২১)। ঐ সময় হঠাৎ উত্তর ভারতের কিছু গ্রাম থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো "চাপাতি" নামে পরিচিত এক ধরনের রুটি? সে রুটি মানুষের হাত ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে যেতে লাগলো হাজার মাইল দূরে। কেন বিতরণ হচ্ছে এই রুটি? কে রয়েছে এর পিছনে? এ রুটি কী কোন গোপন বার্তা পৌঁছাচ্ছে? নাকি পিছনে রয়েছে কোন বড় ষড়যন্ত্র? ইংরেজ শাসকদের কপালে পড়ল চিন্তার ভাঁজ। "চাপাতি" নামক নিরীহ দর্শন রুটিই হয়ে গেল ব্রিটিশ শাসকদের ঘুম নষ্টের কারন। ইতিহাসে এ ঘটনা "চাপাতি আন্দোলন (Chapati Movement)" নামে পরিচিত (নয়ন আসাদ: ২০১৮)। সাদিয়া আফরিন শায়লা (২০২১) তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন-ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীর তৎকালীন সার্জন ডা: গিলবার্ট হ্যাডো ব্রিটেনে তার বোনের কাছে লেখা একটি চিঠিতে এ ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন, "বর্তমানে সমগ্র ভারতজুড়ে একটি রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে, কেউ এর অর্থ জানে বলে মনে হয় না। কোথা থেকে, কার দ্বারা বা কী উদ্দেশ্যে এটি পরিচালিত হচ্ছে, তা আমার জানা নেই। এমনকি ঘটনাটি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বা গোপন কোন সমাজের সাথে সম্পর্কিত কী না, তাও জানা যায়নি। সে ঘটনাটিকে "চাপাতি আন্দোলন" হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

চাপাতি মূলত: গমের আটা দিয়ে তৈরি এক ধরনের খামিরবিহীন রুটি। এটা সাধারনত: তাওয়ায় ভেজে কিংবা খোলা আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করা হয়। হিন্দী 'চপত' থেকে এসেছে চাপাতি, যার অর্থ চ্যাপ্টা। এর আরেকটি অর্থ হয় 'চড়'। হাতের তালুতে নিয়ে ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে থাপড় দিয়ে বানানো হয় এই রুটি। এর চ্যাপ্টা আকার, কিংবা থাপড় দিয়ে বানানো হয় বলেই হয়তো এর এই নাম। ১৬ শতকে আবুল ফজলের লেখা আইন-ই-আকবরীতে সম্রাট আকবরের পছন্দের খাবারের তালিকায়ও আছে এই চাপাতি রুটির উল্লেখ (নয়ন আসাদ: ২০১৮)।

৫.০ চাপাতি-আন্দোলনের উৎপত্তি

কোন কায়েমী শক্তিই দীর্ঘকাল মানুষের স্বাধীন সত্ত্বাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ স্বাধীনচেতা। যতবড় শৃঙ্খলের বেড়ী পায়ে পরানো হোক, মানুষ মুক্তির পথ উদ্ভাবন করবেই।

ভারতের উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে চাপাতি আন্দেলনের সংগ্রামে সে সত্যই ফুঁটে উঠেছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামী যুদ্ধ পরিচালনা , দেশকে হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই চাপাতি আন্দোলনের আবির্ভাব হয়। এ আন্দোলন উৎপত্তির পেছনে ছিল অনেকগুলো কারণ। সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ইংরেজের শোষণ ও নির্যাতন। পলাশী বিপর্যয়ের পরপরই এর প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে সোচ্চার হয়ে ওঠেন নবাব মীর কাশিম, বীরভূমের রাজা আসাদুজ্জামান খাঁসহ অসংখ্য রাজণ্য ও নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় জন্মলাভ করে হাজারো বিদ্রোহ, বিপ্লব ও সংগ্রাম। তারা গণ-মানুষের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করেন এবং তাদের বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন। দেশের প্রতিটি কোনে কোনে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অধ্যাপক শান্তিময় রায় (২০২১) উল্লেখ করেছেন–"ব্রিটিশ শাসননীতি ও ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক ও আদিবাসীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। তাতে মুসলমান, হিন্দু, আদিবাসী, অনাদিবাসী ও অন্যান্য নিম্নবর্গের শ্রমজীবি মানুষ অংশ গ্রহন করেন।' সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ', 'কৃষক-তাঁতীদের সংগ্রাম', 'রংপুর বিদ্রোহ', 'নীলচাষীদের সংগ্রাম', 'লবনশিল্প ও মলঙ্গীদের সংগ্রাম', 'রেশম চাষীর সংগ্রাম', 'ফরায়েজী ও ওয়াহাবি আন্দোলন', 'চোয়াড় ও লায়েক বিদ্রোহ', 'গারো বিদ্রোহ' এবং 'চাকমা, রিয়ং, কোল, ভিল, সাঁওতাল ও মুন্ডা বিদ্রোহ', 'দাক্ষিনাত্যের কৃষক বিদ্রোহ' ইত্যাদি এই সময়কালেই ঘটে। প্রতিটি বিক্ষোভের ও বিদ্রোহের পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ও বিদ্রোহীদের মধ্য থেকেই নেতার আর্বিভাব ঘটে এবং তারাই এই সব বিক্ষোভের ও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন

এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে যুতসই আন্দোলন ও বিপ্লবের জাগরন ঘটাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিষ্মরনীয় নেতা–মওলানা এহিয়া আলি ও মাওলানা আবদুল্লাহ আবিষ্কার করেন এ অভিনব চাপাতি আন্দোলন। যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে 'চাপাতি মুভমেন্ট' ভারতের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই আন্দোলন ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের চিন্তা-ভাবনার অনন্য ফসল, দেশব্যাপী বিদ্রাহের স্ফুলিঙ ছড়িয়ে দিতে একটি কার্যকরী পদ্ধতি। দখলদার ব্রিটিশদের তাড়াতে বিপ্লবীদের আবিষ্কৃত 'অভিনব এক বৈজ্ঞানিক নয়া কৌশলের নাম- 'চাপাতি আন্দোলন'। সারা ভারতে এ আন্দোলন হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। নির্বিঘ্নে সংবাদ সরবরাহ ও আদান-প্রদানে এর বিকল্প নেই। দৈনন্দিন খাবারের সাধারন চাপাতি বা রুটি, যা ঘরে ঘরে সবার হাতের কাছেই মজুদ থাকে। আর এই অতি সাধারন জিনিসকেই বিপ্লবীরা যুদ্ধ-কৌশলের হাতিয়ার বানিয়ে অসাধারন প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ফ্রান্সের দখলদার বাহিনীর হাতে মরক্কোর জনগন যখন নিপীড়িত হচ্ছিল, মরক্কোর তরুন আমীর আল খাত্তাবী তখন শত্রু বিতাড়নে আবিস্কার করেন এক অদ্ভুত পদ্ধতি-- গেরিলা যুদ্ধ! যা বিশ্বের মানুষ চমকে দিয়েছিল। তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের চমকপ্রদ ঘটনা 'চাপাতি আন্দোলন'। শক্তিমান শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে বিপ্লব ঘটানোর অভিনব এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকৌশলটি দখলদার বৃটিশ বাহিনীর ঘুম হারাম করেছিল। উদ্ভাবন শক্তির বিস্ময় চা'পাতি আন্দোলন' প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ-প্রস্তুতি পর্বে রেখেছিল গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা ।

ভারতে বৃটিশ রাজশক্তি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের কারণে ভারতবর্ষে অর্থনীতির বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে পরে। নির্মম অত্যাচার ও অকথ্য নির্যাতনের মুখে বাংলা বিহার থেকে অস্বাভাবিক হারে কর আদায় করেন ব্রিটিশ সরকার। ধান-চালের মৌসুমে জোর করে কেঁড়ে নিতো কৃষকদের সমস্ত খাদ্য-শস্য। শিল্পী-

কারিগরদের সমস্ত পন্য বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করে একচেটিয়াভাবে লন্ডনেই কেবল পাচার করা হতো। এতে ধ্বংস হয় বাংলার হাজার বছরের সমৃদ্ধ শিল্প-বানিজ্য খাত। এমনি নিরন্তর শোষণের ফলে মাত্র দশ বছরের মধ্যেই সমৃদ্ধ বাংলা হয়ে পড়ে হত-দরিদ্র। বাংলা দেখা দিল চরম দুর্ভিক্ষ। অভাবিত এই দুর্ভিক্ষে বাংলার অর্থনীতি, বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতির ওপর গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক কোটি লোক প্রাণ হারানোর ফলে বাংলায় এক তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গলে পরিনত বা অনাবাদী হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বঙ্গদেশের কৃষি উৎপাদন হ্রাস ও খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। উইলিয়াম হান্টারের (১৯৯৬) এর মতে মতে, ঐ সময় (১৭৭০ সাল) থেকেই বাংলার অভিজাতদের দুই-তৃতীয়াংশের অবক্ষয় বা ধ্বংস শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু (২০১১) বলেছেন–"যেসব প্রদেশ সবচেয়ে দীর্ঘকাল ইংরেজের অধিকারে গেছে, ঠিক সেই প্রদেশগুলিই আজ হৃতস্বর্বস্ব দরিদ্রতম। এটা বিশেষভাবে লক্ষনীয় ঘটনা।...এই দারিদ্রের মাপকাঠি হল জনসাধারন। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ প্রদেশের কয়েকটি জেলায় কৃষক-মজুরদের যেরূপ দুরবস্থা, তেমন বোধ হয় ভারতের আর কোথাও নেই।...বৃটিশ অধ্যুষিত হবার আগে বাঙলাদেশ ছিল সুজলা, সুফলা ঐশ্বর্যমন্ডিত দেশ।...একথা সর্বজন স্বীকার্য যে, ঐশ্বর্যময়ী বাংলার আজকের এই শ্রীহীন অবস্থা ঘটেছে বৃটিশ আমলেই।..বাঙলাদেশ সর্বপ্রথম বৃটিশ শাসনের আওতায় আসে ও তার স্বরূপ উপলব্ধি করে। এই শাসনের মূল নীতিই ছিল লুটতরাজ–ইংরেজ বাংলাদেশে এমন একটা রাজ্য-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যার উদ্দেশ্যই ছিল চাষীদের যথাস্বর্বস্ব হরন করা"। যে বাংলার মানুষ ছিল সুখ-সমৃদ্ধির বরপুত্র, তারাই অনাহারের কবলে পড়ে মৃত্যুবরন করে। মানুষের মধ্যে দেখা দেয় চরম অস্থিরতা। খাদ্যের অভাবে বিরান হয়ে পড়ে গ্রামকে গ্রাম। দিশহারা মানুষেরা পঙ্গপালের মত ছুটতে থাকে। মুসলমানদের হাত থেকে শাসনদন্ড কেড়ে নিয়ে তাদের বিত্ত বৈভব লুন্ঠন করে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে ঝাঁকে ঝাঁকে হত্যা করে । বাংলার পুঁজি ও শিল্প পণ্যের সাথে মুসলিম সন্তানদেরকেও ক্রীতদাসরূপে বিলেতে পাচার করে।

উপমহাদেশের আযাদীর জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রথম সংঘটিত হওয়া মুজাহিদদের বালাকোট ময়দানের যুদ্ধই পরবর্তীকালে হাজারো আন্দোলনের জন্ম দেয়।'জিহাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বখত খান, মওলানা আহমদ উল্লাহ শাহ ও মওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী দিল্লী কেন্দ্রে, হাজী এমদাদউল্লাহ, মুন্সী জাফরউল্লাহ্ ও তাঁদের অনুসারীগণ শামেলী, সাহারানপুর, থানাভবন, থানেশ্বর প্রভৃতি এলাকায় সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাসিম নানুতুবী, মওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী, মওলানা মোহাম্মদ মুনীর প্রমুখ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ, দিল্লী ও কানপুরসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসব কেন্দ্রের মধ্যে সুক্ষ্ম জালের মত পরস্পরের যোগাযোগ ধারা বজায় ছিল। বিপ্লবী যোদ্ধাদের পারস্পারিক যোগাযোগের নেপথ্যে ছিল চাপাতি রুটি বিতরন। সর্বসমক্ষে নি:সন্দেহে বহন করার এটি অনিবার্য বাহন ছিল চাপাতি (মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহঃ ১৯৫২) ।

'ফাসীর মঞ্চে' গ্রন্থে মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ (১৯৫২) লিখেছেন- "পাটনার মাওলানা এহিয়া আলি ছিলেন বৃটিশ-ভারতের মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান। পাটনার সাদিকপুর লেনে অবস্থিত একটি বাড়িতে সদর দপ্তর ছিল। দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা হইতে মুক্তি

সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত লোকজনকে পাটনায় উপস্থিত হইয়া কিছুকাল তাহার শিক্ষাধীনে অবস্থান করিতে হইত। মওলানা এহিয়া আলির সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারন। বাংলা হইতে সীমান্ত প্রদেশের দুরত্ব প্রায় দুই হাজার মাইল। নতুন বিপ্লবীদিগকে পায়ে হেটে সমস্ত পথটাই অতিক্রম করিতে হইত। কিন্তু মওলানা এমনই সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন যে, দুই হাজার মাইল পথে একজন নামকরা মুজাহিদও কখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নাই। আন্দোলনের প্রচার, শিক্ষা, পরিচালনা, যোগাযোগ, ও গোয়েন্দাগিরির জন্য হাজার হাজার লোক নিয়োগ করেছিলেন। একবার যে তাঁর সংস্পর্শে সেই-ই তাঁর অসাধারন ব্যক্তিত্যে মুগ্ধ ও লৌহ-মানব হিসেবে গড়ে ওঠার তালিম পেয়েছে। এরা বৃটিশ পুলিশ-মিলিটারীর অকথ্য নির্যাতন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, অর্থলোভ, যশ-খ্যাতি, জমিদারী, তালুকদারী পাওয়া ইত্যাদি কোন রকমেই কাবু হবার নয়। বৃটিশ সরকার হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহাদের একজনকেও আদালতে রাজসাক্ষীরূপে উপস্থিত করতে পারেন নাই। পৃথিবীর কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে ইহার নজীর খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। এতদ্ব্যতীত বিস্তর গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার পর আন্দোলনের অন্যতম সংঘটক মৌলানা এয়াহিয়া আলী ও তার ভাই শাহ্ আহমদউল্লাহ্ এই সিদ্ধান্ত নেন যে, শত্রুর চোখে ধূলো দেয়া যায় এমন একটা কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। ইনি বিপ্লববাদীদের জন্য এমন একটি 'সাঙ্কেতিক ভাষার' প্রবর্তন করিয়াছিলেন যাহা অন্যের পক্ষে একেবারে দুর্বোধ্য ছিল' (অশোক মেহতা ২০১৬)। এই সাঙ্কেতিক ভাষাই ছিল চাপাতি বিলি। স্বাধীনতা যুদ্ধ ও চাপাতি বিলি ছিল একে অন্যের পরিপূরক।

৬.০ চাপাতি-আন্দোলনের উদ্দেশ্য

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭-দীর্ঘ একশ' বছরের বঞ্চনা, ক্ষোভ, অত্যাচারের বিষ্ফোরক উপাদান ছিল এই স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামকে সুষ্ঠরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনিবার্য কর্মসূচী হয়ে ওঠে 'চাপাতি আন্দোলন'। প্রতিটি নগর, শহর, বন্দর, গ্রাম, মহল্লায় এই চাপাতি চিঠি' পৌঁছে দেয়া হতো অলক্ষ্যে। হাজার হাজার রুটি দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলেছে হাতে হাতে , কেন? কারাই বা করছে? কিছুতেই এর কোন কিনারা করতে না পেরে ব্রিটিশ অফিসাররা ক্ষিপ্ত এবং ভীত হয়ে ওঠে। কারণ তারা অনুমান করছিল যে কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু সেটি কি বা কি তার প্রকৃতি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না (নয়ন আসাদ: ২০১৮)। চারদিকে প্রচন্ড ধর-পাকড়, গ্রেফতার, জেরা ইত্যাদি করেও কোনোভাবেই গদিনশীন'রা কোনো সূত্র বের করতে পারছিল না, পারার কথাও নয়। মানুষের মনে ফুঁসে উঠা তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের বারুদ অত্যাচারীর বিতাড়নে বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল। শাসকদের লাঠিয়াল বাহিনীতে কাজ করতো এদেশীয় মানুষেরাই। সেই সিপাহী ভাইদের মনেও দেশপ্রেমিক বিপ্লবী যোদ্ধারা জাগিয়ে তুলেছেন বঞ্চনার আগুন। তারাই দেশ বাঁচানোর সংকল্পে এ রুটির চিঠির বোঝা পৌঁছে দিচ্ছে পরস্পরকে। জীবন বাঁচানো ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তারা জান মাল কুরবানী করে শোষক-শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিপ্লবে ফুঁসে ওঠে এবং জন্ম দেয় প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের। কেউ জানে না কেউ দেখেনা অথচ খবর পৌঁছে যাচ্ছে সর্বত্র। চাপাতি বিতরনের আলোচনা মানুষের মুখ থেকে মুখর হয়ে ওঠে। মুক্তিকামী মানুষেরা 'চাপাতি বিতরন আন্দোলনে'র বাতাবরনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশী দখলদারদের উৎখাতের স্বপ্ন দেখেছিল। মূলত: চাপাতি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল নির্বিঘ্নে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা এবং চলমান সংগ্রামের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা (সাদিয়া আফরিন শায়লা: ২০২১)।

৭.০ কার্যক্রম

'চাপাতি আন্দোলন' বা রুটির চিঠি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি মাইল ফলকঃ যুগান্তকারী এক আবিষ্কার হিসেবে চিহ্নিত। এই কর্মসূচী এদেশের পরাধীন মানুষের মনে লুণ্ঠনকারী ঔপনিবেশিক শাসক- শোষকদের বিতাড়িত করে মুক্তির আশা জাগিয়েছিল। এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রথম নজরে আসে মথুরার ম্যাজিস্ট্রেট মার্ক থার্নহিলের। একদিন বাড়ি থেকে থানায় পৌঁছানোর পর নিজের টেবিলে রুটি বা চাপাটি ভর্তি বস্তা দেখতে পান। এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারেন, রাত্রে এই বস্তা কেউ দিয়ে গেছে। এ ঘটনার সূত্র কোথায় তা বের করতে তদন্ত চালানোর এক পর্যায়ে জানা যায়-- আশেপাশের প্রতিটি গ্রাম ও চৌকিতে এই ধরনের বস্তা পাওয়া যাচ্ছে। এরপর মার্ক বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শুরু করে এবং তদন্তের নির্দেশ দেয়। থার্নহিল তদন্তকালে ভারতীয় সৈন্যদের কোনও সাহায্য পায়নি। কারণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা নিজেরাই চাপাটি তৈরি এবং বিতরণে সহায়তা করছিলেন। এভাবেই মথুরার ম্যাজিস্ট্রেট মার্ক থার্নহিলের চোখের ওপর দিয়েই চাপাতি পৌঁছে যেতে থাকে প্রতিটি গ্রামে। ব্রিটিশরা কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পেলেও জানতে পারে, এক গ্রামে তৈরি চাপাতি এক রাতে ৩০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অন্য গ্রামে পৌঁছায়। চাপাতি পৌঁছানোর এই সুবিধা সে যুগের ব্রিটিশ মেইল সুবিধার চেয়ে অনেকবেশি দ্রুত ছিল। বিপ্লবীদের এই কৌশল ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দিল্লীর বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরও বিপ্লবীদের সমর্থন দেন। তিনি অধিবাসীদের প্রতি এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

এর মধ্যে রুটি বা চাপাতির ঘটনা এসে পড়ে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে এ চাপাতি ঘুরতে থাকে। গ্রামের প্রধান এই চাপাতি অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। কেউ এটা নষ্ট করে না। সরকার অনুসন্ধান করে এর কোনো উৎস বের করতে ব্যর্থ হয়। গুজব রটে যে, এই চাপাতি দেশের মুসলিমদেরকে একসূত্রে গ্রথিত করছে এবং শীঘ্রই সকলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হবে। সত্যেন সেন তাঁর 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'তে চাপাতি রুটি বিলি ও পদ্মফুল বিলি'র ওপর 'বিদ্রোহের প্রচার বাহিনী' নামে একটি অধ্যায়ই লিখেছেন। "একথা প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামে প্রদেশ থেকে প্রদেশে সমস্ত ভারতময়। হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যেই একথা ছড়িয়ে পড়েছিল। এ চিন্তা মানুষের মনে এক অদ্ভুত আশা ও প্রেরনা সৃষ্টি করে তুলল। তাই দেখতে পাই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সূচনা থেকেই ভারতের মানুষ যেন রুদ্ধ আবেগে দুলে দুলে উঠছে। চাপাটির মধ্য দিয়ে প্রচারের কাজ চালানো হয়েছে। এ বিদ্রোহের দূতীরা বিদ্যুৎগর্ভ বানী বহন করে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে চলেছে, যাকেই স্পর্শ করেছে তাকেই বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। কোথা থেকে তারা আসত আর কোথায় যে চলে যেতো একথা কেউ বলতে পারে না।

৮.০ ফলাফল

বড় ধরনের একটি বিদ্রোহ শুরুর সময়ে চাপাতি বিতরণের মতো একটি অভূতপূর্ব কৌশল একদিকে যেমন ইংরেজদের বিভ্রান্ত করে, অপরদিকে এর আড়ালে বিদ্রোহ-যুদ্ধের সশস্ত্র প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হয়। সেই চাপাতি বিতরনের মাধ্যমে সারা দেশে আসন্ন বিদ্রোহের একটি বার্তা পৌঁছে যায়। চারদিকে গুজব

রটে গেল- 'শত বছরে পূর্ণ হলে ইংরেজের পতন অনিবার্য'! শিরার (১৯১০) বলেন, "যদি রুটি বিতরণের উদ্দেশ্য সত্যিকার অর্থেই বিদ্রোহকে ছড়িয়ে দেওয়ার মানসে হয়ে থাকে তবে বলা যায় এটি ছিল অত্যন্ত একটি সফল কূটচাল।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে অংশ নেওয়া গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে চাপাতি এবং গুজব (রিউমার) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কোনো গণ আন্দোলনেই গুজব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উত্তর ভারতে, চালওয়া বা চাপাতি বিশেষ একটি অর্থ বহন করে। যেকোনো মহামারি শুরু হলে চালওয়া বা চাপাতি বিতরণ করা হয়। চালওয়ার মাধ্যমে গ্রামবাসী মহামারি গ্রামের বাইরে বের করতে চায়। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার ঠিক আগে উত্তর ভারতের গ্রামগুলোতে চাপাতি বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু চাপাতি বিতরণকারীদের নাম ছিল অজ্ঞাত। ব্রিটিশ সরকার এই চাপাতি বিতরণ বন্ধ করতে অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুতেই এর কোন সুরাহা করতে পারেন নাই । এক গ্রামের নেতার হাত থেকে দ্রুত অন্য নেতার হাতে ঘুরছিল বিপ্লবের ইঙ্গিতবাহী চাপাতি রুটি। এক সৈন্য আরেক সৈন্যের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন রক্ত-রঙিন আযাদী বিপ্লবের ইঙ্গতবাহী জবা ফুল। সে কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত সুগঠিত। দিল্লী থেকে চট্রগ্রাম পর্যন্ত সবখানে বিপ্লবীদের কার্যক্রমের খবর প্রতিদিনই সতর্কতার সাথে পৌঁছে যাচ্ছিল। ১৮৫৭ সালে জানুয়ারিতে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় মাওলানা আহমাদুল্লাহর বলেনঃ দেশবাসী, আপনারা জেগে উঠুন। ফিরিঙ্গি কাফেরদের উৎখাত করতে আপনারা সংঘবদ্ধ হন। এই কাফেররা ন্যায়কে পদদলিত করেছে, আমাদের স্বরাজ্য তারা লুন্ঠন করেছে। এই কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সে সংগ্রাম হবে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জেহাদ।

কানিজ মুরাদ (২০১৯) লিখেছেন, কয়েক সপ্তাহ পর উত্তর ও মধ্য ভারতের গ্রামগুলোতে রহস্যময় চাপাতির আর্বিভাব ঘটতে লাগল। এই ছোট রুটিগুলোর ছয়টার একটা করে প্যাকেটে পাওয়া যেতে লাগল। রাতে কে বা কারা গ্রামের নৈশ প্রহরীর কাছে এগুলো দিয়ে যায়, সেই সঙ্গে বলে যায় আশেপাশের ছয়টি গ্রামেও সেগুলোকে যেন বন্টন করা হয়। যারা পাবে তারা আবার ছয়টা চাপাতির প্যাকেট বানাবে এবং অন্য ছয়টি গ্রামেও সেগুলোকে বন্টন করবে। মাত্র তিন সপ্তাহের মাথায় সবচেয়ে ছোট এলাকাতেও এই চাপাতিগুলো পৌঁছে গেল। সবাই ভাবতে লাগল ব্যাপারটা কি ! তবে সবাই বুঝতে পারছিল যে এটা কোন বড় ঘটনার পূর্বাভাস।

ভারতে যে এমন আন্দোলন হয়েছিল, এবং তা ইংরেজের মাথাব্যাথার কারন, হ্যাডোর চিঠি থেকেও এটা স্পষ্ট। এটি কোনও ছোটখাটো ঘটনা ছিল না বরং 'চাপাতি আন্দোলন' ব্রিটিশ রাজের রাতের ঘুম কেঁড়ে নিয়েছিল। এই কারণেই গিলবার্ট হ্যাডো এই ঘটনাকে প্রয়োজনীয় এবং এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন এবং বোনকে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। তখনকার ভারতের দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে এই আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

৯.০ সাফল্য

১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রাম আপাত-ব্যর্থ মনে হলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে এই আন্দোলনে প্রভাব ও ভূমিকা অপরিসীম। ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে জনগণের মুক্তির সংগ্রামী ঐতিহ্য ও চেতনার জন্য বিপ্লবাত্মক-স্বাধীনতাকামী ঘটনা-প্রবাহ পরবর্তী পর্যায়ে বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল। বাস্তবতার উদাহরন হলো ১৮৫৭ সালে এই আন্দোলনের মাত্র ৯০ বছর পরই সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাত হয়।

ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে উপমহাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। উইলিয়ম ডারলিম্পল (২০০৬) লিখেছিলেন-"১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ-যুদ্ধের শিক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্য কারও দ্বারা নিজ অঞ্চল দখল হয়ে যাওয়া, অত:পর নিজ থেকে উৎখাত অথবা অস্ত্রের হুমকির মুখে তাদের অধীনে হীন জীবন যাপন-এটা কারোরই কাম্য হতে পারে না"। কোনও সন্দেহ নেই আজকেও মানব জাতির প্রধান সমস্যার নাম সাম্রাজ্যবাদ আর আধিপত্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদের শিকড় উৎপাটনের যুগে যুগে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের শিক্ষার প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলায় চাপাতি আন্দোলন গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রেখেছিল। সারা ভারত জুড়ে 'রুটির চিঠি' বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিপ্লবের বানী। খুব সহজেই 'রুটির চিঠির মারফত মানুষকে বিপ্লবে সম্পৃক্ত করা ছিল এক সৃদূর প্রসারী চিন্তার সুফল। এর বদৌলতে অনেকটা সহজেই হয়েছে শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ইংরেজের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরার খবর পৌঁছানো। দখলদার শক্তিকে বিভ্রান্ত করতে চাপাতি কর্মসূচী অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে মাওলানা এয়াহিয়ার ' রুটির চিঠি'র অনুকরণে বাংলার হিন্দু-সন্ত্রাসবাদী 'অনুশীলণ ও যুগান্তর' দলের কর্মীদের জন্য একটি সাঙ্কেতিক-ভাষা চালু করেছিল। বর্তমান সময়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দলের মধ্যেও চাপাতি আন্দোলনের অনুকরনে সাংকেতিক ভাষার প্রচলন রয়েছে।

১০.০ উপসংহার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কোন আকস্মিক ঘটনা ছিলনা বরং এটি ছিল বিভিন্ন বিদ্রোহ, আন্দোলন ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের বহু দশক ব্যাপি সমন্বিত ফলাফল। ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগঠকদের উদ্ভাবিত এই চাপাতি বিতরন কর্মসূচী- 'রুটির চিঠি'বা চাপাতি বিলি স্বাধীনতা যুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। এটি সমাজের গভীরে সৃষ্টি করেছিল প্রচন্ড আলোড়ন। অভিনব এই উদ্ভাবন পরবর্তীকালের ভারতেবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ-প্রস্তুতি পর্বে 'রুটির চিঠি'র ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপুর্ণ। খুব অল্প সময়ে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা রুটির চিঠি চাপাতি আন্দোলন যুদ্ধের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল। ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অভিনব এই আবিষ্কার তাদের মুক্তির পথ-সম্বল হয়ে উঠেছিল। যদিও বেশিরভাগ আন্দোলন ও সংগ্রাম দালাল, সুবিধাভোগী, ও তাাবেদারদের কারণে সুসংহত হতে পারেনি, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়, তবু এ ধরনের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও সশস্ত্র বিপ্লবই স্বাধীনতা সংগ্রামের সোপান তৈরী করে, জাতীয় জীবনে আনে মুক্তির ছাড়পত্র। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বাধীনতার প্রথম রক্ত-পিচ্ছিল ধাপটি কয়েকযুগ ধরে মুসলমান রাজ-রাজণ্যদের রক্ত ঝরিয়েই তৈরী হয়েছিল। উপনিবেশিক শাসকের গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলতে মুক্তিপাগল মানুষেরা সেদিন সংগ্রামী সংবাদ বাহক এই 'চাপাতি' রুটি হাতে ছুটে বেড়িয়েছিল দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোন রকম সন্দেহের জন্ম না দিয়ে প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত খুব সহজ ও নিরাপদে পৌঁছে যাওয়ার সক্ষমতার কারণেই এই অভিনব চাপাতি আন্দোলন ইংরেজের বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। ইংরেজ সরকার অনেক চেষ্টা করেও এই 'চাপাতি বিতরন' কর্মসূচী বন্ধ করতে পারেনি। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রহস্যময় ' চাপাতি আন্দোলনে'র রুটির চিঠি অনন্য এক দলীল হয়ে রয়েছে। এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ব্রিটিশ শোষনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ যেমন এদেশের মানুষের মুক্তির সনদ

প্রতিষ্ঠা করেছিল, তেমনি অমর ভূমিকা রেখেছিল 'চাপাতি আন্দোলন'। যুগে যুগে অত্যাচারীদের প্রতিরোধে এই আন্দোলন-সংগ্রাম প্রেরণা যোগাবে মানুষের মনে।

Authors' Declaration

We declare that the submitted manuscript is our original work and has not been published, nor is it under consideration for publication elsewhere. All sources have been properly cited, and the work is free from plagiarism, falsification, and fabrication. Any use of Artificial Intelligence (AI) tools in preparing this manuscript has been transparently disclosed, and full responsibility for the content rests with the authors.

তথ্যসূচী :

মোহাম্মদ আদুল মান্নান (২০১৮); আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা; প্রকাশক-সবুজপত্র পাবলিকেশসন্স; সপ্তম মুদ্রন।

মেজর জেনারেল এম এ মতিন (২০২১); বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সতেরোশ' সাতান্ন থেকে উনিশশ' সাতচল্লিশ'; প্রকাশক : দি ইউনিভার্সেল একাডেমি; ৩য় সংস্করন।

জওহরলাল নেহেরু (২০১১); দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া; চারদিক প্রকাশনা।

মোহাম্মদ আবদুল গফুর (২০০৫);পলাশীর শিক্ষা আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যত',দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ জুন ২০০৫।

মোহাম্মদ আবদুল গফুর (২০০৮); স্বাধীনতার গল্প শোন; বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশনস; ঢাকা।

রজনীকান্ত গুপ্ত (১৩১৭); সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস'৩য় খন্ড; সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী।

সাদিয়া আফরিন শায়লা (২০২১); ভারতবর্ষের রহস্যময় চাপাতি আন্দোলন; ব্রিটিশদের মহাশঙ্কটে ফেলে দেন; দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড; ২২ ডিসেম্বর ।

নয়ন আসাদ (২০১৮); চাপাতি আন্দোলন; রুটি যখন ঘোল খাইয়েছিল বৃটিশ শাসকদের; রোর (roor) মিডিয়া; সেপ্টেম্বর ৬।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ (১৯৫২); ফাঁসির মঞ্চে; কোহিনূর লাইব্রেরি।

অশোক মেহতা (২০১৬); আঠারোশ' সাতান্নের বিদ্রোহ; দিব্য প্রকাশ; অক্টোবর।

জে ডব্লিউ শিরার (১৯১০); Life During the Indian Mutiny; Legend Publications; Alahabad, India,।

উইউলিয়ম হান্টার (১৯৯৬); দ্যা ইন্ডিয়ান মুসলমানস; অনুবাদ আবদুল মওদুদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস।

উইউলিয়ম ডালরিম্পল (২০০৬); দি লাস্ট মোঘল: দি ফল অব এ ডাইনেস্টি; দিল্লী, ১৮৫৭, ব্লুমসবারী পাবলিশিং।

কানিজ মুরাদ (2019); ইন দ্য সিটি অব গোল্ড এন্ড সিলভার-'বিদ্রোহী বেগম; অনুবাদ : তানজিনা বিনতে নূর, প্রকাশক : নবপ্রকাশ।